অধ্যায় ৬: দারুশিল্প, বাঁশ বেতের শিল্প, মাদুর ও শীতলপাটি, পাটজাত শিল্প ও বয়নশিল্প

বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্প দারুশিল্প। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশে কাষ্ঠ শিল্পের সঙ্গে অনেক সম্প্রদায় যুক্ত ছিলেন। কাঠুরিয়া, করাতি, ছুতোর, কাষ্ঠভাস্কর, খোদাইকর এবং লেপ চিত্রাঙ্কন শিল্পীরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ছুতোরেরা ছিলেন নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য হিন্দু সম্প্রদায়। মহাভারতের কর্ণ ছিলেন সূতপুত্র। সেকালের ছুতোরেরা কাঠের রথ তৈরি করতেন এবং রথের সারথীও হতেন। মধ্যযুগে নৌকা প্রস্তুত করতেন এরা। মধ্যযুগের নৌশিল্প শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির চিহ্ন বহন করে। মধ্যযুগের দারুশিল্পীরা তাদের শিল্পকাজে চিরন্তন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি ব্যাঙ্ক নির্ভর ছিল না। গ্রাম- পল্লীর অর্থনীতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সরল। সে কারণে একালের শেয়ার মার্কেটের মত ছিল না সেকালের অর্থনীতি। লোকসমাজে সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তা ছিল লোকশিল্প। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের উপর পণ্যের দাম ওঠানামা করত। দারুশিল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠের প্রয়োজন হত। পল্লী গৃহস্থেরা আসবাবের জন্য এমন কাঠের গাছ লাগাতেন। ছুতোরেরা কাঠের আসবাব তৈরি করতেন। নৌকা, রথ প্রভৃতি বহুমূল্য লোকশিল্প সাধারণত বণিক ও অভিজাতরা তৈরি করাতেন। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটেছে বাংলার দারুশিল্পে। মোটামুটি বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল স্বনির্ভর। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ দারুশিল্পগুলি হল নৌকা, রথ, দরজা, খাট, পালঙ্ক, সিংহাসন, কাঠের আসন, পিঁড়ি প্রভৃতি। ছুতোরেরা কাঠের দরজা তৈরির সময় শুভাশুভবোধ এবং সামাজিক রীতিনীতিকে মান্যতা দেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে, পালঙ্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার মেনে চলতে হয়। বাবা অথবা মায়ের মৃত্যু হলে সেই বৎসর পালঙ্ক ব্যবহার করা হয় না। নৌকা, রথ এবং সিংহাসন তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পীরা হিন্দু পুরাণ, দেববাদ এবং মিথের সাহায্য অনুসারী হয়ে ওঠেন।

বাংলাদেশে ডোম সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বাঁশ বেতের শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ব্রাত্য অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই বাঁশ বেতের শিল্প এবং ঝুড়ি বোনার কাজ করেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে বাঁশ বেতের যে সব শিল্প উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কুলা, চালুনি,

ঝাঁটা,চুপড়ি, ডালি, লাঠি বা নড়ি, সাজি, বেনু বা বাঁশি প্রভৃতি। দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনে, লোকাচারে, শুভ অনুষ্ঠানে এবং স্ত্রী আচারে এই শিল্পগুলির প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের সমন্বয় এই শিল্পগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মাদুর ও পাটি শিল্প বাংলার লোকশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মাদুর কাঠির চাষ হত। কাঠি দিয়ে পাটি বুননের সময়েও কাঠিতে নানা রঙের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। কাঠিতে নানা শিল্পকলা অঙ্কন করা হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাদুর এবং শীতলপাটির তুলনা মেলা ভার। কবিকঙ্কণের কাব্যে পাটি এবং শতরঞ্চির উল্লেখ আছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান পাটি বিছিয়ে নমাজ পাড়তেন। মধ্যযুগের বাণিজ্যে শিল্প বিনিময়ে হত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি দত্ত পাটির বিনিময়ে কম্বল নিতে চেয়েছেন। সেকালে অতিথি অভ্যর্থনা গৃহের প্রধান আসবাবরূপে পাটির ব্যবহার হত। আমরা সেই সেকালকে অনেক দূরে ফেলে এসেছি। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বয়ন শিল্পের প্রচলন ছিল। তন্তুবায় বা তাঁতি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁতি চরকায় সুতো কেটে কাপড় বুনতেন । কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য বয়ন শিল্পগুলি হল- ধুতি, ভুনি, মেঘডম্বুর শাড়ী, কৌপীন এবং নিছনি। এছাড়া পাটজাত শিল্পের মধ্যে পট্টবস্ত্র কবিকঙ্কণের কাব্যের উল্লেখযোগ্য বয়নশিল্প। মধ্যযুগের সাহিত্যে পাটের শাড়ীর ব্যবহার বেশি। কবিকঙ্কণের কাব্যে আবার পাটের শাড়ীর বহুল ব্যবহার। পট্টবস্ত্র ঐশ্বর্যের প্রতীক। ব্যাসদেবের মহাভারতের মহারাজা দুর্যোধন পরেছেন পট্টবস্ত্র। বাংলাদেশের বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এসব শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মধ্যযুগের শীলিত সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন শিল্পীরা। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা ছিলেন সৌন্দর্য সন্ধানী। শিল্পীরা তাঁদের শিল্পে এঁকে দিয়েছেন সৌন্দর্য চিহ্ন। এঁকেছেন মোটিফ, প্রতীক। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে এসব শিল্প দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে সাহিত্য মূল্যে উন্নীত করেছেন।

দারুশিল্প

দারুশিল্প বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্প। কাঠুরিয়ার কাটা কাঠে শিল্পীরা শিল্প সৃষ্টি করেন। তক্ষণ বা কাঠ দিয়ে যেমন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আসবাব, গৃহস্থালি শিল্প সামগ্রী সৃষ্ট হয়, তেমনি দেবদেবীর মূর্তি এবং ভাস্কর্য নির্মিত হয় এমন কাঠ দিয়ে। পুরীর মন্দিরের জগন্নাথ

বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি কাষ্ঠ নির্মিত।বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গৌর নিতাই-এর মূর্তি দারু নির্মিত। এক কথায়, সেই সুদূর আদিমকাল থেকে আগুন জ্বালানোর মধ্য দিয়ে কাঠ মানবসভ্যতার সহায়ক হয়েছে। কাঠের ব্যবহারক্ষেত্র অনেক। মধ্যযুগের দরজা জানালা, খাট পালঙ্ক, চৌকি ,বাক্স, আলমারি, পুতুল, খেলনা, দেবদেবীর মূর্তি, ভাস্কর্য, রথ, চাকা, লোকযান প্রভৃতি লোকশিল্প কাষ্ঠ নির্মিত। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশে কাষ্ঠশিল্পের সঙ্গে অনেক সম্প্রদায় যুক্ত ছিলেন। কাঠুরিয়া কাঠ কাটতেন, করাতি করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করতেন। সূত্রধর বা ছুতরেরা দরজা জানালা, খাট পালঙ্ক তৈরি করতেন। কাষ্ঠভাস্কর এবং খোদাইকরেরা কাঠের ভাস্কর্য এবং দেবদেবীর নানা মূর্তি খোদাই করতেন। সর্বোপরি লেপচিত্রাঙ্কন শিল্পীরা রঙ এবং বার্নিশ-এর সাহায্যে নানা রঙের প্রলেপে কাঠের আসবাবকে উজ্জ্বল করে তুলতেন। কিন্তু দারুশিল্পের ব্যবহারক্ষেত্র অনেক কমে এসেছে। কাঠের ব্যবহৃত আসবাব এবং দৈনন্দিন শিল্পেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।আর কাঠের সেই ভাস্কর্য আজ প্রায় গেছে হারিয়ে। শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য' প্রবন্ধে লিখেছেন- " বঙ্গের এমন ভাস্কর্য (দারু) আজ সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। বাঙালি-হৃদয়ের উচ্ছল আনন্দরসধারা আর দেবমূর্তিতে মূর্তিপরিগ্রহ করে না।"[১]

কবিকঙ্কণের কাব্যে দারুশিল্পের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে-

ক) দরজা, কপাট- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেব বন্দনা অংশে শিবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা দরজা ভেঙে দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করেছেন।কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"কপাট ভাঙ্গিয়া ভাঁড়ার লুটিয়া
ঘৃত মধু ঢালে তুণ্ডে।"[২]

বণিক খণ্ডে কপাটের উল্লেখ এসেছে। খুল্লনা সপত্নী লহনা এবং দাসী দুর্বলার ষড়যন্ত্র কপাটের আড়াল থেকে শুনেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"লহনা দুবলা মেলি জত কিছু ভনে
কপাটের আহড়ে খুল্লনা সব শুনে।"[৩]

দরজায় দেবদেবীর মূর্তি এবং নকশা চিত্র অঙ্কিত হত। বাঙালির জাতীয় জীবনের চিত্রকলা অন্বেষণ করতে হলে কাঠের দরজা, খাট, পালঙ্ক এবং পালকিতে অঙ্কিত খোদাই চিত্রের অন্বেষণ জরুরি হয়ে পড়ে।

খ) খাট- খাট সংস্কৃত 'খট্টা' থেকে এসেছে। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থের লেখক ভোজের মত অনুযায়ী খাট আট প্রকার। সেগুলি নিম্নরূপ-

"মঙ্গলা বিজয়া পুষ্টিঃ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখাসনম্

প্রচণ্ডা সর্বতোভদ্রা খট্বানামষ্টকং বিদুঃ।।

আসাং বিভাগঃ পূর্ব্ববৎ।"[৪]

বিছানা বা শয্যার ধারক বা আধার হল খট্টা বা খাট। সূত্রধর বা ছুতোরেরা খাট তৈরি করেন। খাট তৈরির সময় শুভাশুভবোধ ও রীতিনীতিকে মান্যতা দেওয়া হয়। চন্দন কাঠের খাট শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।কবিকঙ্কণের কাব্যে খাটের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতরূপে-

১) খাট (পৃ. ৭৬) ২) খাট (পৃ.৬৮) ৩) খাট (পৃ. ১১৯) ৪) খাট (পৃ. ১৬১- ২ বার উল্লিখিত) ৫)খাট (পৃ. ১৬৫ -৪ বার উল্লিখিত) ৬) খট্টা (পৃ. ২১৮ -২ বার উল্লিখিত)

[উপরিউক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া][৫]

কলিঙ্গরাজ প্রজাদের উপর নামিয়ে এনেছেন অর্থনৈতিক শোষণ। কলিঙ্গ দেশ ছেড়ে বুলান মণ্ডলেরা গুজরাট চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। 'খাটদড়ি' দিয়ে জমি জরিপ করছেন। বৃষ্টি-প্লাবন-বন্যায় ঘরের চাল ভেসে গেল। সঞ্চিত ধন ডুবে গেল কিন্তু রোম সম্রাট নিরোর মতই প্রজার ক্রন্দন কানে নিলেন না কলিঙ্গরাজ।তিনি খাট দড়ি দিয়ে জমিজমা নিয়ে নিলেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"মসহাত করিল রাজা দিআ খাট দড়ি।"[৫ (ক)]

চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে কালকেতু কিনেছেন খাট পালঙ্ক।কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'শকট বিমান রথ কিনে বীর শত শত

খাট পালঙ্গ কিনে দাসী।'[৬]

বণিক খণ্ডে দেখা যাচ্ছে, ধনপতি দত্তের শয়নকক্ষের খাট সেকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের চিহ্ন বহন করেছে।রাজা এবং অভিজাত মানুষের খাট চন্দন কাঠের তৈরি হত, সোনার পাতে মোড়া,নানাবিধ মণিমাণিক্য খচিত। হাতির দাঁতের ওপর লতা পাতা এবং কারুকার্য শোভিত হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

‘সাধুর ইঙ্গিত ধরে প্রবেশিআ বাসঘরে

খাট করে চন্দনে ভূষিত’। [৭]

খুল্লনা খাটের তলায় আত্মগোপন করেছেন। ধনপতি দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়েছেন। খাটকে সজীব ভেবেছেন, প্রশ্ন করেছেন, কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

“কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী”।[৮]

আমাদের পল্লীর ছুতোরেরা খাট পালঙ্ক প্রস্তুত করেন। এগুলির মধ্যে আছে লোকশিল্পীর সরল হৃদয়। ‘প্রাচ্য – প্রসাধনকলা’ প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন- “ প্রাচ্য-প্রসাধনকলার এই যে একটি নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্য ভাব, ইহাতেই ইহা রমণীয় এবং এই ভাবের গুণেই কবিহৃদয়ে ইহা এমন সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।”[৯]

গ) পালঙ্ক - সেকালে পালঙ্ক ‘শ্রীপর্ণী’ কাঠের দ্বারা নির্মিত হত—

“ যঃ সর্ব শ্রীপর্ণ্যা পর্যঙ্কো নির্মিতঃ স ধন দাতা।

অসনকৃতো রোগহরস্তিন্দুকসারেণ বিত্তকরঃ”

যে পর্যঙ্ক কেবল শ্রীপর্ণী-কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত তাহা ধনপ্রদ,......। শালকাষ্ঠ রচিত এবং শাককাষ্ঠ রচিত পর্যঙ্ক কল্যাণ প্রদান করে”।[১০]

ধনপতি দত্তের অবর্তমানে লহনা সপত্নী খুল্লনার উপরে অত্যাচার করেছেন, অমর্যাদা করেছেন। তাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন।

পালঙ্ক, তুলার তোষক , গদি ও অলংকার কেড়ে নিয়েছেন লহনা। খুল্লনাকে পরিয়েছেন খোসলা বা চটের বস্ত্র—

" পর্যঙ্ক তুলিকা পাড়ি   নিহ অভরণ- পেড়ি
দিহ তারে খোসলা উড়নে।"[১১]

হিন্দুশাস্ত্রে পালঙ্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার মেনে চলতে হয়। বাবা অথবা মায়ের মৃত্যু হলে সেই বৎসরে পুত্র পালঙ্ক ব্যবহার করেন না। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর 'স্মৃতিচিন্তামণিঃ' গ্রন্থে লিখেছেন-

"কাষ্ঠাসনং পাদুকে চ পর্য্যাঙ্কং ছত্রমেব চ।
প্রথমেহব্দে ত্যজেন্মর্ত্যো মহাগুরু নিপাতনে। "[১২]

একালে কাঠের পালঙ্কের ব্যবহার থাকলেও তা কমে এসেছে। সেকালের দারুশিল্পীদেরও আর এ কালে পাওয়া যাবে না। ষ্টীলের আসবাব, আধুনিক কালের কলে তৈরি বহুজাতিক কোম্পানির সৃষ্ট শয্যায় সেকালের পালঙ্কের সেই কদর আর নেই।

খ) সিংহাসন- সেকালের তক্ষণ শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন সিংহাসন। তক্ষণ শিল্পীরা চমৎকার শিল্পের নমুনা রেখেছেন সিংহাসন তৈরির মধ্য দিয়ে। রাজার ব্যবহৃত সিংহাসন রাজ প্রাসাদের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য এবং শক্তির প্রতীক। রাজ সিংহাসন ছাড়াও দরিদ্র পল্লীর কুটীরে কুটীরে ধর্মপ্রাণ বাঙালি দেবদেবীর প্রতি ভক্তির নিদর্শন রেখে গেছেন সিংহাসন তৈরি করে। দেবদেবীর মূর্তিকে শ্রদ্ধা আনত বাঙালি সিংহাসনে উপবিষ্ট করিয়েছেন। পুজো করেছেন। সূত্রধর বা ছুতোরেরা সিংহাসন তৈরি করেন। সিংহাসন তৈরির জন্য চন্দন কাঠ আদর্শ। ছুতোরেরা হাতুড়ি বাটালি ও করাত দিয়ে অনেক শ্রমে, যত্নে সিংহাসন তৈরি করেন। কাষ্ঠ শিল্পীরা সিংহাসনের দেওয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কন করে তাদের শিল্প সৌন্দর্যের চিহ্ন রেখে গেছেন। সিংহাসন তৈরির পর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা মাঙ্গলিক উপকরণ, যথা - সিঁদুর, চন্দন প্রভৃতি দিয়ে সিংহাসনে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে সিংহাসনের উল্লেখ এসেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

'সাঁপুড়া চুনাতি বাটা   উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা

সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।'[১৩]

একালে দারু শিল্পের ব্যবহার কমে এসেছে। শিল্পে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। আর কাঠের সেই ভাস্কর্য আজ প্রায় হারিয়ে গেছে। সেকালের ধর্মপ্রাণ শিল্পীরা একালে আর নেই। মধ্যযুগের রীতি-নীতি, সংস্কার- বিশ্বাস, শুভাশুভবোধ, পুরাণ অনুসরণ করে একালের শিল্পীরা হয়তো আর শিল্প সৃষ্টি করেন না। মধ্যযুগের একটি সময়কে শাশ্বত করে গেছেন মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে।

বাঁশ বেতের শিল্প

বাঁশ 'ঘাস' শ্রেণীভুক্ত শক্ত সরল দীর্ঘ উদ্ভিদ। বাংলার লোকশিল্পের অনেকখানি জুড়ে আছে বাঁশ। বাঁশের ঘর , বাঁশের বেড়া, বাঁশের মণ্ডপ, বাঁশের খুঁটি, বাঁশের লাঠি, বাঁশের বাঁশী- বাঁশের নানা শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালির ঘর-দোর। এছাড়া বাঁশের কুলা, ঝুড়ি, চালুনি, চুপড়ি, ডালি, পুতুল, মোড়া, চেয়ার, তাঁতের সরঞ্জাম, খেলনা, মগরী, মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রভৃতি বাঁশের নানা শিল্প প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজন পূরণ করেছে। প্রয়োজন অতিরিক্ত সৌন্দর্য বাঁশের শিল্পকাজে মুগ্ধতা এনে দেয়। নানা সংস্কার- বিশ্বাস পূজা পার্বণে বাঁশ নানা প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। বিবাহে পাত্র পাত্রীর কথাবার্তা এবং বিবাহের দিন স্থিরের সময় বাঁশের প্রতীক ব্যবহার করে দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পূজা দেওয়া হয়। পূজা অনুষ্ঠান এবং গৃহ প্রবেশের সময়ও বাঁশের পূজা দেওয়া হয়। বিয়ের বেদি তৈরি হয় বাঁশ দিয়ে।

সমগ্র বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরায় প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ বাঁশের তৈরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। H.H. Risley (Herbert Hope Risley) তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে ডোম সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখেছেন—" Doms believe their original profession to be the making baskets and mats, and even the menial and seavenging sub-castes follow these occupations to some extent.[........] The Bajunia sub –caste are employed to make highly discordant music at marriages and festivals. His women-folk, however,

only perform as musicians at the wedding of their own people, it being considered highly derogatory for them to do so for outsiders. At home the Domni manufactures baskets and rattles for children."[১৪]

বাংলাদেশের ডোম সাম্প্রদায়ের লোকেরা এই শিল্পের উত্তরাধিকার বহন করে থাকেন। কুলো, মুগরী, পাটা, ডালা, ঝুড়ি শুধু প্রয়োজন মেটায় না, এ সব শিল্পের সৌন্দর্যও বিশেষভাবে চোখ টানে। কবিকঙ্কণের কাব্যে বাঁশের তৈরি শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুলা, চালুনি, ঝাঁটা , চুপড়ি, ঝুড়ি, ডালি, বেনু(বাঁশী), লাঠি প্রভৃতি। বাঁশ বেতের শিল্পীদের ঋষি বলা হয়। নৌযাত্রার সময়ে বাঁশ পূজা করা হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতির নৌযাত্রার শুভ মুহূর্তে এমন বাঁশ পূজা করা হয়েছে –

"বাঁশ কেরআলে ই কূল কললোলে
পুজিল দিআ পুষ্প গন্ধে"।[১৫]

হিন্দুর জীবনচর্যা নানা আচার, সংস্কার- বিশ্বাসের প্রতিফলন। শতশত বছরের ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার হিন্দুর লোকায়ত রীতিকে ধারণ করে আছে। শুভ মুহূর্তের যাত্রাপথে নানা মঙ্গল সংস্কারে পূর্ণ হিন্দু জীবনবোধ। মঙ্গল কবি মুকুন্দরাম লোকজীবনের নানা সংস্কারকে তাঁর কাব্যে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন।

কুলা- কুলা বাঁশের তৈরি। কিন্তু সবটা বাঁশের নয়। কুলাতে বাঁশের বুনন শেষ হলে বেত দিয়ে কুলার চারপাশের বুনন কার্য করা হয়। তাতে কুলা শক্তপোক্ত এবং টেকসই হয়। কুলোর বাতাস দিয়ে চালের তুষ উড়িয়ে চাল বের করা হয়। ডোম সম্প্রদায়ের শিল্পীরা কুলো তৈরি করেন। বাংলা সাহিত্যে কুলোর ব্যবহার অনেক। 'কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করা'- এসব প্রবাদ জীবন্ত। সৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যকে শক্তি দিয়েছে এমন প্রবাদ। বাংলাদেশে কুলাকে নিয়ে অনেক রীতি এবং স্ত্রী আচার গড়ে উঠেছে। সেকালে ঢেঁকির সঙ্গে কুলাও পূজা পেত। লক্ষ্মীপূজা এবং নবান্ন উৎসবে কুলাকে শুচিস্নাত করে মঙ্গল সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হত। বিবাহে বরণ কুলার ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী আচার। গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'বাংলার রসকলা প্রতিভা' প্রবন্ধে লিখেছেন –"বিবাহ ইত্যাদি পর্বে বরণ-কুলা ব্যবহারের প্রথা বাংলার পল্লী জীবনে একটি

অতি মনোরম জিনিস; যদিও আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রথাটি আজকাল প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এই তুচ্ছ বাঁশের তৈরি বরণ কুলাগুলিকে বাংলার পল্লীর মেয়েদের অসাধারণ কলা প্রতিভা যে কি অপরূপ সৌন্দর্যের আধার করে তোলে তা বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের জিনিস। মেয়েরা কুলার ভিতরের দিকটায় সাদা কাপড় লাগিয়ে তাতে মাটির একটা পাতলা আস্তরণ দিয়ে তার উপর চিত্র এঁকে থাকেন"। [১৬]

কবিকঙ্কণের কাব্যে কুলা এসেছে। আখেটিক খণ্ডে ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর কাছে উপঢৌকন স্বরূপ ঢেঁকি কুলারও দাবী করেছেন । কবি লিখেছেন –

"হাল বলদ দিবে খুড়া   দিবেহে বিছন- পুড়া

ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে"।[১৭]

বণিক খণ্ডে সওদাগর ধনপতি দত্ত বাণিজ্য যাত্রা করবেন সুদূর সিংহল প্রদেশে। বহু দূরের পথ- বিদেশ, বিভুঁই। জীবন সংকট হতে পারে। কল্পনায়, অতিকথনে সেই ভয়ঙ্কর বীভৎসতার পরিমাণ বেড়ে যায়। চেনা বাস্তবকে অতিক্রম করে কল্পনা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'উডুষ কচ্ছব কুলা   সষা জেন মশাগুলা

জলৌকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার।'[১৮]

হিন্দু বিবাহের সময়ে কুলার ওপর খৈ রেখে সামাজিক রীতি নীতি পালন করা হয়। নববধূর মা, ভাই বা ব্রাহ্মণ কুলার ওপর খৈ রাখেন। নববধূর ডান পা শিলায় রাখেন এবং জামাতা মন্ত্র পড়েন। 'অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র' গ্রন্থে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখেছেন –"পরে বধূ খৈ কুলায় লইবেন এবং জামাতা ঐ কুলার শেষার্দ্ধের উপর এক বার পূর্ব্ববৎ ঘৃতধারা দিয়া তাহার উপর শেষ খৈ দিয়া তাহাতে পুনরায় দুইবার ঘৃতবিন্দু দিয়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া কুলার অগ্রভাগ দিয়া লাজহোম করিবেন।"[১৯]

চালুনি, ঝাঁটা- ডোম সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বাঁশ চেঁছে, শৌখিন চতুষ্কোণ ঘর সদৃশ ফাঁক রেখে চালুনি তৈরি করেন। বাঁশ দিয়ে চালুনি নির্মাণ পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল চতুষ্কোণ নকসা। নানা লোকজ পদ্ধতিতে হাতের চাপে চাল, মুড়ি থেকে তুষ এবং ধুলো মুক্তো করার উপযোগী করে

কুলো তৈরি করেন লোকশিল্পীরা। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে লোকশিল্পীরা বাঁশের শিল্পের নানা ধরনের বয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার অধীত শিক্ষা এক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রধান সহায়। সাধারণ অলংকরণে চালুনিও নান্দনিক হয়ে ওঠে। শিল্পীদের শিল্পবোধ, স্থানিক পরিবেশ, বংশ পরম্পরায় অনুশীলন এই শিল্পের সৌন্দর্য নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' গুজরাট নগরে ডোমেরা বসতি স্থাপন করেছেন। তারা তৈরি করেছেন চালুনি, ঝাঁটা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা

কির্তি করে হরষিত চিতে।'[২০]

ডোমেরা যেমন চালুনি বোনে , তেমনি কুলো এবং চাঙাড়ি বোনে। শ্রীনিশাপতি মাজি 'গরিবের হাতের কাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"বাঁশ শিল্পঃ ডোমদের বাঁশই প্রধান উপজীবিকা। বাঁশের মোড়া, চেয়ার,বাসকেট, জাবরি, ঝুড়ি, কুলা, পেতে, চালুনি, সাজি, টপ্পর, ধানের হামার, মই, ডোল, গাড়ি, খাল্লা, মাচা প্রভৃতি আব্যশক ও কৃষিকার্যের জিনিস তৈরি করে ডোমরা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে। [...........] শিল্পীর ছোঁয়াচে জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজনের জন্য মোড়ার খরিদ্দার ও বাজার সৃষ্টি হয়।" [২১] বাঁশ শিল্পে সৌন্দর্য, প্রয়োজন এবং অন্নসংস্থান সবই সম্ভব হয়।

চুপড়ি- চুপড়ি বাঁশের তৈরি এক অপরূপ শিল্প। চুপড়ির তলা ,পাশ,ওপরের মোড়া ,বাঁধুনি , বুননের বৈচিত্র্য ,প্রকারের ভিন্নতা ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পীরা লাভ করেন। , চুপড়ির তলদেশ চতুষ্কোণউপরের অংশ ধীরে ধীরে , গোলাকার করে তোলা হয়। বাঁশ টুকরো করে চেঁছে নমনীয় করে বিভিন্ন ডিজাইনের চুপড়ি তৈরি করেন লোকশিল্পীরা। চুপড়ির নকশা চমৎকার সৌন্দর্যের দ্যোতক। এরকম চুপড়ি ডোম সম্প্রদায়ের মেয়েরাও তৈরি করেন। চুপড়ি শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায় না, অনেক শৌখিন জিনিসও চুপড়ির মধ্যে রাখা হয়। চুপড়ির গায়ে কড়ি বসিয়ে তৈরি করা হত এক ধরনের কড়ির শৌখিন চুপড়ি। চুপড়ি হিন্দু বাঙালি গৃহস্থের নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও ব্যবহার হয়। হিন্দু বিবাহে কনে যখন শ্বশুরবাড়ী যানতখন , এক স্ত্রী আচার পালন করা হত। কনের কোলের উপর কড়ির চুপড়ি বসিয়ে দেওয়া হত।

সিঁদ ,ধূপ ,কড়ি ,হলুদ ুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক উপকরণ চুপড়িতে রেখে কনেকে দেওয়া হত। একালে গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় ভেঙে গেছে। লোকায়ত শিল্পীরা বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন| বিবাহ ব্যবস্থা এবং মাঙ্গলিক আচারঅনুষ্ঠানে বদল এসেছে। স্বাভাবিকভাবে এই- শিল্পও বিনষ্টির মুখে। তাছাড়া প্লাস্টিক, কাঁচ, ফাইবার প্রভৃতি পেট্রোরসায়ন শিল্পের অগ্রগতি এই শিল্পের ধ্বংসমুখকে উন্মোচিত করেছে।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে চুপড়ি সমগ্র কাব্যের নানা স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। কালকেতু নানা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আনেন। আর ফুল্লরা চুপড়িতে রেখে সেগুলি হাটে বিক্রি করেন--

'চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা।'[২২]

কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত পয়সা না দিয়ে নানা দ্রব্যে চুপড়ি ভরেন—

'পসরা লুটিআ ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি।'[২৩]

এইভাবে ভাঁড়ু কাঁচকলা, পুঁইশাক এবং কলার মোচা চুপড়িতে ভরে নিয়েছেন--- 'চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলির মোচা।'[২৪]

কিংবা, "গোধিকা চুপড়ি ঢাকি চাপিল পাষাণে"।[২৫]

কালকেতু ষোড়শী কন্যাকে(ছদ্মবেশী চণ্ডী) ঘরে এনেছেন। ফুল্লরা কুপিত-

"চুপড়ি পসার পাটি ছাড়িল ফুল্লরা"।[২৬]

বণিক খণ্ডে দুর্বলা হাটে চলেছেন তসরের শাড়ি পরে। চুপড়ি ভরে কিনেছেন নানা রন্ধন সামগ্রী--- "কিনিঞা রন্ধন- সাজ কিছু কিছু নিলি ব্যাজ

হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে"।[২৭]

সন্তানসম্ভবা খুল্লনা সাধভক্ষণের ইচ্ছা পোষণ করেন। মসুর ডাল, আমের আমসি, শোল মাছ এবং নানা শাক খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। চুপড়িতে ভরে নানা শাক সংগ্রহ করেন লহনা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন---

"সাক তুলিতে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি।

কাখে কর‍্যা নিল দুয়া রঙ্গিন চুপড়ি"।[২৮]

পেট্রো-রসায়ন শিল্পের অগ্রগতি ঝুড়িবোনা শিল্পকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। প্লাস্টিক ফাইবারের ব্যাপক ব্যবহার এবং ডোমদের বৃত্তি পরিবর্তন এর মূলে। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে লিখেছেন-- " এইসব লুপ্ত এবং প্রায়লুপ্ত কারুকৃতির

নমুনা সংগ্রহ করতে পারলে, কেবল ঝুড়িকুলোডালা নিয়েই বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম লোকশিল্পের আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়।"[২৯]

ঝুড়ি, ডালি- ঝুড়ি দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রাচীনকাল থেকেই এই শিল্প সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই প্রচলিত ছিল। বিনয় ঘোষ তার "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব" গ্রন্থের "ঝুড়ি বোনা শিল্প" প্রবন্ধে লিখেছেন—"লোকশিল্পের আধুনিক বিলাসী গুণগ্রাহীদের বাংলার লোকশিল্পের যে প্রাচীন ঐতিহ্যময় দিকটি প্রায়ই নজর এড়িয়ে যায়, অথচ আমার ব্যক্তিগত ধারণায় যেটা বাংলার লোকশিল্পের সবচাইতে অপরূপ ধারা, সেটি হচ্ছে ঝুড়িবোনা শিল্প (basketry)। [.........] পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রামে, যেখানেই একটি ভিন্ন ডোমপাড়া রয়েছে, সেখানেই এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের এক একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।"[৩০]

বাঁশ বেতের এই শিল্প ডোমদের প্রধান জীবিকা। বাঁশকে চেঁছে নানা আকৃতিতে এমন ঝুড়ি বোনা হয়। অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্য দিয়ে বংশপরম্পরায় শিল্পীরা বাঁশের শ্রেণী চিহ্নিত করে এমন নকশা সংযোগে অসামান্য নান্দনিক দক্ষতায় এমন ঝুড়ি তৈরি করেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খন্ডে এমন ঝুড়ির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ---

"কাখে করি রঙ্গন -ঝুড়ি আইল বামনী বুড়ি
মসানে পাতিল নানা মায়া।

....

"হাথে নড়ি কাখে ঝুড়ি কোথার বড়াই বুড়ি
প্রবোধ বচন নাহি মানে"।[৩১]

আবার সিংহল দেশে বুড়ি ঝুড়ি কাঁখে চলেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন---'

"হাতে নড়ি কাখে ঝুড়ি আইল বামুনী বুড়ি
কোন নৃপতির হয়্যা চর"।[৩২]

ঝুড়ি বোনা শিল্পের কুশলী স্রষ্টারা প্রায় আজ নেই। এই শিল্পের বিনষ্টিও একরকম অনিবার্য। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে লিখেছেন-- " উৎকৃষ্ট 'মসলিন' কাপড়ের মতো এইসমস্ত অপরূপ ঝুড়িডালা, উৎকৃষ্ট 'মসলন্দ' অথবা 'শীতলপাটি'ও চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।"[৩৩]

ডোমেরা যেমন ঝুড়ি তৈরি করেন, তেমনি ডালি তৈরি করেন। ঝুড়ি, কুলো, ডালা, বেত এবং বাঁশের শিল্পের নানা উপকরণ ডোমদের শিল্পিত হাতের ফল। কবিকঙ্কণের কাব্যে ডালি এসেছে –

"মাথায় সুরঙ্গ ডালি তবকী ধানকী ঢালি
পাইক আইসে কাহনে কাহনে"।[৩৪]

সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য দৈনন্দিন এমন শিল্পকে চিরন্তন করে রেখেছে ডোম সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। ব্রাত্য, অপাংক্তেয় ডোমদের রয়েছে সহজাত সৃষ্টি প্রতিভা। বাংলাদেশের ডোমেরা যথার্থ শিল্পী। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে লিখেছেন- "ঝুড়ি বোনা বাংলাদেশের ডোম জাতির প্রধান পেশা, [...........] এ শিল্পে, ডোম জাতির পুরুষ, নারী এমনকি শিশুদেরও রয়েছে এক বংশগত দক্ষতা"। [৩৫]

বেনু ,বাঁশি- বাঁশের বাঁশি চমৎকার লোকশিল্প। কৃষ্ণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক। তাঁর হাতে থাকত বাঁশের বাঁশি। কৃষ্ণের বাঁশিতে থাকে সাতটি ছিদ্র। এই বাঁশি 'সপ্তঘাট' যুক্ত। কবিকঙ্কণের কাব্যে অবশ্য বেতের বাঁশি এসেছে। বণিক খন্ডে শ্রীপতি যেন কৃষ্ণেরই ভিন্ন রূপ। শ্রীমন্তের কোমরে বেতের বাঁশি, আর গলায় লম্বিত বনমালা। কৃষ্ণের মতই কদম্ব তলায় শিশুদের মত যেন খেলে চলেছেন শ্রীমন্ত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন---

"অঙ্গে গোধূলি- রেণু কটিতটে বেত্র বেনু

অজানু লম্বিত বনমাল।"[৩৬]

বাঁশের বাঁশি বা বেতের বাঁশির ব্যবহার একালে প্রায় নেই। তালপাতার বাঁশিও গেছে হারিয়ে। রাখালের বাঁশি। মন কেমন করা বিকেল। প্রেমিকের মন উন্মনা হয়ে ওঠে। জসীমউদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যে 'সুখের বাসর' কবিতায় রূপাই বাঁশি বাজায়—

"বাঁশের বাঁশিতে ঘুণ ধরেছিল, এতদিন পরে আজ,

তেলে জলে আর আদরে তাহার হইল নতুন সাজ।

সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশী।

মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি !"[৩৭]

লাঠি, নড়ি- লাঠি বাঙালির এক অভিজাত শিল্পকলা, গৌরবেরও বটে। লাঠির মধ্যে লোকশিল্পী রেখে গেছেন তাঁর শিল্পসত্তার পরিচয়। লাঠি বাঁশ বা বেতের তৈরি। একদিন বাঙালির গৌরবের দিন ছিল- লাঠির জোর ছিল। বাঁশ বেত ছাড়াও শাল, সেগুন কাঠের লাঠিও তৈরি হত। সেকালে জমিদারেরা লাঠি ব্যবহার করতেন।আর অভিজাত বাবুরাও লাঠির ব্যবহার করতেন। লাঠির ব্যবহার সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তি এবং সম্ভ্রমবোধের প্রতীক। লাঠির গায়ে নকসা আঁকা হত। সোনা বা রূপা দিয়ে বাঁধানো হত লাঠি। লাঠি আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার হয়। বার্ধক্যে, অশক্ত অবস্থায় মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করেন। এর আর এক নাম নড়ি। মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক চাঁদ সদাগরের হাতে লাঠি থাকত। নকসী কাঁথার মাঠ কাব্যের নায়ক রূপাইয়ের হাতে থাকত লাঠি। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করতে গিয়ে তরুণদের লাঠি খেলায় উৎসাহিত করেছেন। গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী নৃত্যে লাঠির ব্যবহার আছে। শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজ’ উপ্যনাসের নায়ক রমেশ লাঠি খেলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লাঠির সেই প্রাচীন গৌরব আজ আর নেই। শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা লাঠি হাতে আজো ঘোরাফেরা করেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যে লাঠি এসেছে। কালকেতুর গুজরাট নগরে যেমন সন্ন্যাসী এসেছেন, তেমনি এসেছেন বৈষ্ণব। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

“সদা লয় হরিনাম ভূমি পায় ইনাম
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে
কাঁথা কমন্ডলু লাঠি গলায় তুলসী- কাঁঠি
সদাই গোঙায় গীত-নাটে”।[৩৮]

বণিক খন্ডে বৃদ্ধার লাঠি হাতে গুটি গুটি পায়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার ছবির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ—“হাতে নড়ি কাখে ঝুড়ি কোথার বড়াই বুড়ি”।[৩৯]

কিংবা – “হাথে নড়ি কাখে ঝুড়ি আইল বামুনী বুড়ি”।[৪০]

বাংলার সংস্কৃতিতে এককালে লাঠির গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। কিন্তু একালে বাঙালির সে গৌরবের দিন আর নেই। সেকালের জমিদারেরা লাঠি ব্যবহার করতেন। যারা লাঠি ব্যবহার করতেন, তাদের দেখে সাধারণের সম্ভ্রমবোধ উদ্রেক হত। জমিদারদের লাঠি সোনা রূপায় বাঁধানো থাকত। লাঠির নানা নাম – নড়ি, যষ্ঠী প্রভৃতি । কবিকঙ্কণের কাব্যে বামুনী বুড়ির একান্ত সঙ্গী হয়েছে লাঠি। জমিদারদের লাঠি হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু দরিদ্র বৃদ্ধ – বৃদ্ধাদের লাঠি থেকে যাবে। তবে লাঠির সে ঐতিহ্য এবং গৌরব চিরকালের মত অন্তর্হিত হয়ে গেছে। লাঠির সে গৌরবের দিন সত্যই অন্তর্হিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপ্যনাসে লিখেছেন—"এই যোদ্ধাদিগের নাম "বরকন্দাজ"। অনেক সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে এই বারকন্দাজদিগের লাঠির চোটে পালাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ – হায়! বন্দুক আর সঙ্গিন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।"[৪১]

সাজি- ফুল সাজিয়ে রাখার জন্য বিশেষ অলংকৃত বাঁশের চুপড়ি হল সাজি। সাজি বাঁশ বা বেতের তৈরি। ডোম সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীরা সাজি তৈরি করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে সাজির উল্লেখ আছে। গুজরাট নগরে মালাকার সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেছেন। সাজি দণ্ডে ফুল রেখে তারা নগরে নগরে পরিভ্রমণ করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দন্ড করি কান্ধে

ফিরে তারা নগরে নগর"।[৪২]

খুল্লনার বিবাহ উৎসবে সাজির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। কবি লিখেছেন—

"লোহ ভাণ্ডে দারু সাজি ছোটায় আতস বাজি

এক কালে শতেক বিজুলি"।[৪৩]

বাংলাদেশের শুভ উৎসবে শিল্পী সম্প্রদায়ের ভুমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উৎসবে কুম্ভকার নতুন ভাঁড় আনেন। মালাকার – ডোম প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শুভ উৎসব' প্রবন্ধে লিখেছেন –"অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত।"[৪৪] ফুলের সাজিও এমন শুভ উৎসবের অঙ্গ।

একালে সামাজিক অনুষ্ঠান তাঁর অতীত গৌরব হারিয়েছে। ভেঙে গেছে মধ্যযুগের পল্লীর সামাজিক দৃঢ় সমাজ সংগঠন। বৃত্তিজীবী শিল্পী মানুষদের গৃহস্থের উৎসব অনুষ্ঠানে সেই কোমল কর স্পর্শের ছোঁয়া আজ আর মেলে না। বিগ-বাজার, শপিং মল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব এসেছে গৃহস্থের উৎসব অনুষ্ঠানে। কবিকঙ্কণের কাব্যে মধ্যযুগের একটি সময়ক্ষণ বিম্বিত হয়ে আছে।

শীতলপাটি,মাদুর, পট্টি সতরঞ্জ

"Basket and mat- making are callings naturally suited to the primitive tribes who would obtain the bamboos from the forest, but weaving would not be associated with them unless cloth was first woven of tree- cotton."[৪৫] বাংলার লোকশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রেখে গেছে পাটি। শীতলপাটি এবং মাদুর বাংলার কলা শিল্পকে সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্যে ভরিয়ে রেখেছিল এককালে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পটাশপুর, সবং প্রভৃতি অঞ্চলে মাদুর কাঠির চাষ হত।বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও কাঠির চাষ হত। কাঠি যত সূক্ষ্ম এবং মসৃণ হবে, ততই পাটি সুন্দর, নরম ও শৌখিন হবে। পাটি তৈরির আগে কাঠিকে নানা রঙের প্রলেপে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কাঠি দিয়ে পাটি বুননের সময়ে নানা শিল্পকলা অঙ্কন করা হয়। সাধারণত ফুল, পাতা, জীবজন্তু, ময়ূর, বিবাহের উপহার, নানা নকশা বিশেষত পদ্ম, পরী প্রভৃতি চিত্র অঙ্কন করা হয়। আর শীতলপাটি প্রস্তুতের সময় 'উলুছন' বা তৃণলতা মসৃণভাবে কাটতে হয়। আর বাঁশের পাতলা চঁচা বের করে 'ছাওনী কাঠি' দিয়ে শীতলপাটি

তৈরি করা হয়। শীতলপাটিতে বেত চেঁছে নানা চিত্রকলার অঙ্কন করা হয়। শীতলপাটির শিল্পীরা প্রায় হারিয়ে গেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন – 'ফরিদপুর জেলায় সাতৈর নামক গ্রামে এরূপ মাদুর ও পাটী নির্ম্মিত হইত, যাহার কারুকার্য্য অতুলনীয় , শ্রীহট্টে সেই পাটী কখনও কখনও হাতীর দাঁত দিয়া তৈরি হইত। দাবা খেলিবার ঘর, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি সেই পাটিতে অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সহকারে বুনন হইত। [........] এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের দুটি দান – একটি মসলিন আর একটি শীতলপাটি । আমরা মসলিন ধ্বংস করিয়াছি , কারণ আমরা তাহার মূল্য ও উপযোগিতা বুঝতে পারি নাই। শীতলপাটি আর বাজারে বিকায় না, দামী বিলাতী 'রাগ্ বা কম্বল' ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা মেদিনীপুর জেলার একখানি পাটীর প্রতিলিপি দিতেছি। [.......] একটিমাত্র বৃদ্ধ এরূপ পাটী নির্ম্মাণ করিতে পারেন। তৃণ-লতা চাঁছিয়া প্রায় সূতার মত সূক্ষ্ম করা হইয়াছে। যে অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য এই পাটীতে দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এখানকার দিনে বিরল।" [৪৬]

কবিকঙ্কণের কাব্যে পাটির উল্লেখ এসেছে। গুজরাট নগরে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা এসেছেন। আখেটিক খণ্ডে লক্ষ করা যাচ্ছে, লোহিত পাটি বিছিয়ে নমাজ পড়ছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী

পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ"।[৪৭]

ফুল্লরা বারমাসের সুখদুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেছেন দেবী চণ্ডীর কাছে। গোলাহাটে গিয়ে কালকেতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার কুঁড়ে ঘরে ফিরে এসেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'চুপড়ি পসার পাটি ছাড়িল ফুল্লরা।'[৪৮]

বণিক খণ্ডে ধনপতি বাণিজ্য যাত্রার সময়ে ডিঙ্গায় নানা শিল্পসম্ভার নিয়েছেন। বাংলাদেশের পাটির বিনিময়ে তিনি পাবেন পামরী কম্বল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"সকল্লাথ পামরী কম্বল পাব বদল করিআ পাটি।'[৪৯]

এ ছাড়া কবিকঙ্কণের কাব্যে মাদুর শীতলপাটির সদৃশ পাতের কার্পেটের উল্লেখ আছে। গুজরাটে নানা শ্রেণীর প্রজারা বসেছেন। কালকেতু উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছেন 'পট্টি শতরঞ্জ'।

- 'চামর পামরি ভোট সকল্লাত গজঘোট

পট্টি শতরঞ্জ লাখে লাখে।'[৫০]

বাঙালির জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মাদুর বা পাটির যোগ ছিল একদিন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গৃহকোণ' প্রবন্ধে লিখেছেন - "আমাদের সকলেরই এক একটি থাকিবার স্থান আছে। [.....] ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিলেই অতিথিকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলা যায়। [...........] এই মাদুর আমাদের অভ্যর্থনাগৃহের প্রধান আসবাব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এমন আরামের আসন অল্পই আছে। এবং মাদুরের পাড়ে বিচিত্র রঙ্গীন কারুকার্য্যে অনেক সময় গৃহের ঔজ্জ্বল্যও বিশেষ বর্দ্ধিত হয়"।[৫১]

বয়নশিল্প

বাংলাদেশের বয়নশিল্প পৃথিবী বিখ্যাত। ঢাকা ছিল বয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। তাঁতি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা তাঁত বুনতেন। বিদেশীদের চোখেও বাংলার তাঁতিরা ছিলেন শিল্পী – ' Native artist'. 1851 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacturers of Dacca in Bengal' গ্রন্থে John Mortimer লিখেছেন- "..........the principle operations described being illustrated with woodcuts copied from drawings executed by a self –taught native artist. It may be observed that the most striking feature of these processes, and, indeed, of all the mechanical arts of India, is the apparent inadeuacy of the means employed, when contrasted with the results produced. With instruments of rude construction articles are there manufactured which, both in quality and beauty, frequently surpass similar works executed by complicated machinery in other countries. "[৫২]

তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীরা হলেন তন্তুবায় বা তাঁতি। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, হিন্দু রমণী এবং ধোবা সম্প্রদায়ও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। John

Mortimer তাঁর ‘ A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacturers of Dacca in Bengal’ গ্রন্থে লিখেছেন-

“ The art of sewing in Bengal is almost entirely confined to the Mahomedan portion of the community. It is not practised among the Hindoos, except by a few persons (chiefly females) of the castes of dhobee, but it is a branch of industry in which they do not display any skill” [৫৩]

বাংলার এই বস্ত্র পারস্য, আরব, মিশর এবং তুর্কীস্থানেও পৌঁছে যেত। George C.M. Birdwood তাঁর ‘The Arts of India’ গ্রন্থে লিখেছেন –“ The fine cotton manufacture of santipur arose from its having been the centre of the large factories established in the Nuddea division, in the old day of East India Company. The demand for the old cotton flowered and sprigged muslins of Dacca in Europe has almost entirely fallen off, but there is a brisk and increasing demand for tussur embroidered muslins, which denominated throughout India, Parsia, Arabia, Egypt, and Turkey.”[৫৪]

তন্তুবায় বা তাঁতি চরকায় সুতো কেটে কাপড় বুনতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে মধ্যযুগের ব্যবহৃত বস্ত্র শিল্পের মধ্যে পাটশাড়ীর উল্লেখ সবচেয়ে বেশি। পাটশাড়ীর আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। এছাড়া ধুতির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। আর মেঘডম্বুর শাড়ীর উল্লেখও কবির কাব্যে এসেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ‘প্রাচীন বাংলার গৌরব’ গ্রন্থে লিখেছেন –

“ কাপাসের কাপড়ও বাংলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মসলিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার ওপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটির ভিতর দিয়া এক থান মসলিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইত। তাঁতিরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের খেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের

তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সুতা পাকাইত, তাহাতেই মসলিন তৈয়ার হইত।"[৫৫]

ঋগ্বেদ সংহিতায় বস্ত্র বয়ন শিল্পের উল্লেখ আছে। ২য় মণ্ডলের ৩৮ সূক্তে বস্ত্র বয়নকারিণী রমণীর উল্লেখ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ – "পুনঃ সমব্যদ্বিততং বয়ংতী মধ্যা কর্তোর্ন্যধাচ্ছক্ম ধীরঃ"[৫৬]

৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৯ সূক্তে অনেক চেষ্টার দ্বারা বস্ত্র বয়নের উল্লেখ আছে| -" নাহং তংতুং ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ংতি সমরেহতমানাঃ "[৫৭] বোঝা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকে বস্ত্র বয়ন শিল্পের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে। বাংলার তাঁতি পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী হয়ে ওঠেন। R. V. Russell তাঁর ' The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, Vol-I গ্রন্থে লিখেছেন- "Thus The Tantis made the world renowned fine muslins of Dacca."[৫৮]

ক) ধুতি- মধ্যযুগের বাঙালি পুরুষের পরিধেয় কাপড়ের নাম ধুতি। মধ্যযুগের অভিজাত রমণীরা যেমন পাটশাড়ি পরতেন, তেমনি পুরুষেরা পরতেন ধুতি। তুলো দিয়ে সুতো তৈরি করে একইভাবে তাঁতিরা ধুতি তৈরি করতেন। ধুতির কাপড় সাদা। চরকায় মোটা এবং সূক্ষ্ম উভয় প্রকার সুতো কেটে ধুতি তৈরি করতেন তাঁতিরা।

কবিকঙ্কণের কাব্যে ধুতি এসেছে। গৌরীর বিবাহ উৎসব। এমন শুভ মঙ্গল অনুষ্ঠানে পার্বতী বিবাহ বিষয়ক লোকাচার পালন করেছেন। রূপবতী পার্বতী হলুদ লাগানো ধুতি পরেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"পার্বতী রূপবতী হরিদ্রাজুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।"[৫৯]

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবপূজা করেন। কাননে পুষ্পচয়নে যাবেন তিনি। সকালে গঙ্গাজলে স্নান করে সাদা ধুতি পরিধান করেছেন তিনি। দেবপূজায়, পুণ্যকাজে সাদা ধুতি পরিধানের রেওয়াজ আছে। কবি লিখেছেন –

'গঙ্গাজলে করি স্নান শুক্ল ধুতি পরিধান

প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।’[৬০]

কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করেছেন। গুজরাট নগরে তন্তুবায় বা তাঁতি সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেছেন। তাঁতিরা সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলেছেন পাড়া। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

‘শত শত এক জায় গুজরাটে তন্ত্রবায়

ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া’[৬১]

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব)’ গ্রন্থে লিখেছেন –“ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়,[..............] তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক ছোট ছিল; হাঁটুর নিচে নামাইয়া কাপড় পরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।”[৬২]

একালে বাঙালি আর প্রায় ধুতি পরে না। কালে ভদ্রে পথে ঘাটে কখনো সখনো ধুতি পরা বাঙালি পুরুষের দেখা মেলে। পুরোহিতরা মঙ্গল অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার সময় উজ্জ্বল নববস্ত্র (ধুতি) পরেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

‘পরিআ উজ্জ্বল ধুতি কাখেতে পুরাণ-পুথি’

হাতে কুশে নাচে পুরোহিত।’[৬৩]

হিন্দু তন্তুবায় সম্প্রদায় বাড়ির কাছাকাছি কোন ছায়াঘেরা স্থানে তাদের বয়ন কার্য সম্পন্ন করতেন। John Mortimer 1851 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর লিখিত ‘A Descriptive and Historical Account of the cotton Manufacturers of Dacca in Bengal’ গ্রন্থে লিখেছেন –“ The Hindoo weaver is said erect his loom under the shade of any wide-spreading tree near his house.”[৬৪]

খ) তসরের শাড়ী- বাংলাদেশে তসরের শাড়ী অভিজাত বস্ত্ররূপে পরিগণিত। রেশম থেকে শিল্পীরা তসরের শাড়ী বোনেন। এজন্য গাছে গুটি পোকার চাষ করে গুটিকে সেদ্ধ করে জলে ডুবিয়ে রেশম বের করে শাড়ী বোনা হয়। আশ্চর্য কারুকার্য খচিত এবং লাবণ্যে ভরপুর এমন শাড়ী। কিন্তু একালে এই শাড়ীর ব্যবহার খুবই কম। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে তসরের শাড়ীর উল্লেখ আছে। লহনা পরেছেন তসরের শাড়ী।কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"কপালে চন্দন চুয়া হাথে পান মুখে গুয়া

পরিধান তসরের শাড়ি।"[৬৫]

বৃক্ষমধ্যে লাক্ষার চাষ করে লাক্ষাকীটের গুটি থেকে রেশম সংগ্রহ করা হয়। একসময় এই শিল্প ভারতবর্ষের বয়নশিল্পীদের অর্থনৈতিক উজ্জীবন এনে দিয়েছিল। 'বীরভূমের লাক্ষা-শিল্প' প্রবন্ধে শ্রীগৌরীহর মিত্র লিখেছেন –"এদেশে ইংরেজদিগের আগমনের পূর্বে এইসমস্ত শিল্প বেশ উন্নতির পথেই চলিতেছিল, কিন্তু ইংরেজদিগের আগমনের পর হইতেই অনেক শিল্পই যেন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া একেবারে নিম্নমুখী হইয়া পড়িয়াছে।"[৬৬]

গ) ভুনি- হিন্দু বিধবা মহিলারা এক ধরনের পাড়হীন সাদা বস্ত্র পরেন। এই বস্ত্রই হল ভুনি। মধ্যযুগে এই বস্ত্রের প্রচলন ছিল। একালেও প্রাচীনা হিন্দু বিধবা মহিলারা এই বস্ত্র পরেন। তবে সেকালের সেই পল্লী গ্রামের তাঁতিরা গেছেন হারিয়ে। সেই গ্রাম্য হাট কিম্বা পল্লী পরিবেশও আজ আর নেই। একালের বস্ত্র তৈরি হয় কলে-কারখানায়, নাম না জানা সংখ্যা চিহ্নিত শ্রমিকের শ্রমে, রক্তে, ঘামে। এক কথায়, সেই পল্লী শিল্প গেছে হারিয়ে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে 'ভুনি' কাপড় এসেছে। গুজরাট নগরের তাঁতি সম্প্রদায় ধুতির সঙ্গে বোনেন ভুনি-

"ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া"[৬৭]

বণিক খণ্ডে লহনা স্বামীকে বশ করার জন্য সখী ব্রাহ্মণী লীলাবতীর সাহায্য নিয়েছেন। এজন্য তিনি লীলাবতীর কাছে পাঠিয়েছেন দাসী দুর্বলাকে। দুর্বলা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হয়েছেন, পরেছেন –'বারো হাত ভুনি'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"দোছোট করিআ পরে বার-হাত ভুনি।

দুবলা চলিত জেন কুঞ্জরগামিনী"।'[৬৮]

মানুষ যথার্থ মানুষ হওয়ার সাধনার পথে একধাপ এগিয়েছে বস্ত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। মানুষ লজ্জা অনুভব করেছে। মানুষ সভ্য হয়েছে।নিরাভরণ মানুষ সভ্য হয়েছে।'প্রাচীন শিল্প

পরিচয়’ গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন-“সভ্যতার উন্মেষকালেই বস্ত্র-শিল্পের আর্বিভাব হইয়াছিল।”[৬৯] বাল্মীকি রামায়ণে রাজ পরিবারে ক্ষৌম(গাছের ছালের বস্ত্র) ও কৌশেয় (রেশমী বস্ত্র) নামে একপ্রকার অভিজাত বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। মহাকবি লিখেছেন –

“কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমাধ্যমা[.........।]

কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ।

মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ।।”[৭০]

অতসি, পাট, শন প্রভৃতি গাছের ছাল থেকে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাঁর নাম ক্ষৌম। বনগমনকালে সীতাদেবী মাটিতে শয়ন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিল ‘কৌশেয়’। সীতাদেবীর উত্তরীয় বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন মহাকবি –

“উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।

তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ।”[৭১]

কৌশেয় বা কৌশিক বস্ত্র হল রেশমের কাপড়। এই কাপড় ‘পট্টবস্ত্র’ নামেও পরিচিত।

ঘ) মেঘডম্বুর কাপড় - মেঘডম্বুর কাপড় মধ্যযুগের বাংলাদেশের অভিজাত বণিক রমণীদের পরিধেয় বস্ত্র। লহনা চিরুনী দিয়ে কেশ পরিচর্যা করেছেন, কবরী বেঁধেছেন। দর্পণে মুখ দেখেছেন। আর পরনে পরেছেন মেঘডম্বুর শাড়ী। ‘সেকালের বসন-ভূষণ’ প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-

“গুয়ামুটি করবী বাঁধিয়া মেঘডম্বুর কাপড় পরিয়া বিনোদ কাঁচুলি আঁটিয়া দোয়ালি কাকালি বাঁধিয়া লহনা কায়ক্লেশে বয়স কমাইয়া আনিল।”[৭২]

কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

“মাছ্যাতা দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড়

বাছিআ পরত্র মেঘডম্বুর কাপড়।”[৭৩]

প্রাচীনকালে বস্ত্রশিল্পের শিল্পকলার উৎকর্ষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাপড়ের ওপরে সোনালী কাজের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের যুগেও লক্ষ করা যায়, রাবণ 'রুক্মপট' অর্থাৎ সোনার কাজ করা কাপড় পরিধান করেছেন। রাজসভায় প্রবেশ করার সময়ে রাবণ এমন বস্ত্র পরেছেন। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন –

"সুর্বণরজতাস্তীর্ণাং বিশুদ্ধস্ফটিকান্তরাম্।

বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদাম্।।"[৭৪]

একালের রমণীরা আর মেঘডম্বুর শাড়ী পরেন না। কলের কারখানাঘরে বহু সংখ্যা চিহ্নিত শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত শাড়ীই তাদের সম্বল। মধ্যযুগের সেই প্রাণবন্ত শিল্পী তাঁতিরাও আজ আর নেই। হারিয়ে গেছে তাদের আঙুলের শিল্পকলা। মুকুন্দের কাব্য সেই অতীত যুগকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

পাটজাত শিল্প

শিল্পের উপাদান রূপে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তন্তু পাট। বাংলাদেশের নিম্ন জলাভূমি এবং উর্বর মাটি পাট উৎপাদনে অনুকূল। পাট তুচ্ছ প্রয়োজন থেকে শুরু করে শিল্পকলার উচ্চস্তরীয় ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত। নানা লোকশিল্প সম্ভার পাট দিয়েই তৈরি হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে পাটজাত শিল্পের গুরুত্ব লক্ষ করা গেছে। পাট থেকে উচ্চস্তরীয় ও অভিজাত শিল্পকলার নিদর্শন মধ্যযুগের সাহিত্যকে বিশেষত্ব দিয়েছে। এসব লোকশিল্প তুচ্ছ উপকরণে তৈরি হলেও, শুধু সামাজিক প্রয়োজন মেটায় না, এগুলির সৌন্দর্যগত দিককে উপেক্ষা করা যায় না। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Handicrafts of India' গ্রন্থে লিখেছেন—" It (Handicrafts) arises from the deeper hunger of humanity, its functions socialised, for its use is distributed through the family and the entire community. Handicraft is not preoceupied with subjective feeling and thought but objectivity.It can

be asserted that the distinguishing attribute or handicraft is beauty, not merely in physical appearance but also in concept."[৭৫]

পাটবস্ত্র, পাটের শাড়ী- সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে পাটের শাড়ীর ব্যবহার বেশি। পাটের শিল্পকর্মের মধ্যে পট্টবস্ত্র বা পাটের শাড়ীই প্রধান। এছাড়া দৈনন্দিন প্রয়োজনে পাট দিয়ে নানা শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে নিম্নলিখিতভাবে পাটজাত শিল্পকর্মের উল্লেখ বিবৃত হয়েছে। ---

[নিম্নলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত] [৭৬]

আখেটিক খণ্ডে উল্লিখিত পাটজাত শিল্প সামগ্রীঃ

১) 'পাট নেত বস্ত্র' (পৃ. ৩৭) ২) পাটের সাড়ি (পৃ.৫৫) ৩) পাটের গড়া (পৃ. ৬৭, পাটের ঘন মোটা এক প্রকার কাপড়) ৪) পাটের জাদ (চুল বাঁধার রজ্জু বিশেষ,পৃ.৬৮) ৫) নেতের পতাকা, (সূক্ষ্ম পাট বস্ত্রের তৈরি পতাকা (পৃ.৭৯) ৬) 'নেত পাট শাড়ি' (সূক্ষ্ম পাটের তৈরি শাড়ী, পৃ.৮২) ৭) নেতের পতাকা (সূক্ষ্ম পাট বস্ত্রের তৈরি পতাকা, পৃ.৮৭) ৮) খোসলা (পাট বা সন বা চটের বস্ত্র,পুরানো কাঁথা,পৃ.৬১)

বণিক খণ্ডে উল্লিখিত পাটজাত শিল্প সামগ্রীঃ

১) পাট সাড়ি (পৃ. ১১০) ২) পাট সাড়ি (পৃ. ১২০) ৩) পাটের সাড়ি (পৃ.১২১) ৪) নেত সাড়ি (পট্টবস্ত্র, পৃ. ১২৫) ৫) পাট সাড়ি (পৃ.১২৫, ২ বার উল্লিখিত) ৬) পাট সাড়ি (পৃ.১৩৮) ৭) পাটের সাড়ি (পৃ. ১৪৬) ৮) পাটের মসারি (পৃ.১৬১) ৯) পাটের দড়া (দড়ি, পৃ.১৬১) ১০) পাটের ডোরা (পাটের রজ্জু , পৃ.১৬১) ১১) পাটের জাদ (পৃ. ১৬২, চুল বাঁধার রজ্জু) ১২) পাট সাড়ি (পৃ. ১৬২) ১৩) পাটের মশারী (পৃ.১৬৪) ১৪) লোহিত পট্টবাস (পৃ. ১৭৪) ১৫) নেতের আঁচল (পৃ. ১৮৫, পাটের আঁচল) ১৬) পাটের পাছড়া (পাটের বস্ত্র, পৃ. ১৮৬) ১৭) পাটের বসন (পৃ.১৮৯) ১৮) পাটের পাছড়া (পৃ. ১৯১) ১৯) নেতের পতাকা (পৃ. ২১১) ২০) পাটের ধড়া (পাটের বস্ত্র, পৃ. ২১৯) ২১) পাটের পাছড়া (পৃ. ৪০১) ২২) শন দড়ি (পৃ. ২২৯) ২৩) পাটের থোপ (পৃ.২৫১, পাটের অলংকৃত গোছা) ২৪) পাটের পাছড়া (পৃ. ২৫৩)

২৫) পাটের খোপ (পাটের অলংকৃত গোছা, পৃ. ২৫৩) ২৬)পাটের পাছড়া(পৃ. ২৮৪) ২৭)পাটের মসারী (পৃ. ২৯০) ২৮) নেত সাড়ি (পৃ. ৩০৪) ২৯) শ্বেত পাট সাড়ি (পৃ.৩০৪)

পাটের শাড়ীর এত বহুল ব্যবহারের উল্লেখ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে অনন্য করেছে। পাটবস্ত্রকে নানা নামে নামাঙ্কিত করেছেন কবি। নানা বৈচিত্র্যের, নানা প্রকরণের বস্ত্রের উল্লেখ এসেছে কবির কাব্যে।

আখেটিক খণ্ডে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রের পরিধেয় বস্ত্র ছিল পাট বস্ত্র –"পাট নেত বস্ত্র পর গলে রত্নমাল।" [৭৭] ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডী পরেছেন পাটের শাড়ী—

'হুঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পরিআ পাটের সাড়ি

সোল বৎসরের হইল রামা।'[৭৮]

কালকেতু দেবীর কৃপায় অর্থ লাভ করে কিনেছেন ঘন পাটের মোটা কাপড় –

'কনকের সাঁজাকুড়া বিচিত্র পাটের গড়া

মাজকুড়া হিরায় জড়িত।'[৭৯]

ফুল্লরার জন্য কিনেছেন পাটের ফিতে –

' পুরিতে জায়ার সাদ কিনিল পাটের জাদ

মণি-মুকুতা তাহে বেড়ি।'[৮০]

গুজরাট নগরে প্রজাবসতি হয়েছে। কালকেতুর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে শিল্পী বোনেন পাট শাড়ী---

' পাইআ ইনাম বাড়ি বুনে নেত পাট সাড়ী

দেখি বড় বীরের হরিস'[৮১]

বণিকখণ্ডে স্বর্গ নর্তকী রত্নমালা পাট শাড়ী পরে নৃত্য করেছেন –

'কনকের গড়ি চুড়ি   পরি দিব্য পাটসাড়ি

দু করে কুলপি সাজে শঙ্খ।'[৮২]

ধনপতি দত্ত লহনাকে আনন্দিত হয়ে পাটশাড়ী উপহার দিয়েছেন—

'পরিতোষে লহনারে দিল পাটশাড়ি।'[৮৩] খুল্লনার বিবাহ কথা। ফাল্গুন মাসে ধনপতি দত্ত পাটশাড়ী নিয়ে চলেছেন কনে দেখতে।–

'সুরঙ্গ পাটের সাড়ি   লইল রঙ্গন-কড়ি

বিদমালা সুবর্ণে জড়িত।'[৮৪]

খুল্লনার বিবাহ উৎসবে রমণীরা পরেছেন পাটশাড়ী।–'কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট সাড়ি'।[৮৫] বিবাহে নবদম্পতি যৌতুক পাচ্ছেন পাটশাড়ী – 'কেহ সেত কেহ নেত কেহ দেই পাট সাড়ি।'[৮৬] খুল্লনার উপর লহনা অত্যাচার করেছেন, তাঁর পাটশাড়ী খুলে নিয়েছেন, পরিয়েছেন সাধারণ বস্ত্র – ' খুঞ্যা পরাইআ পাট-সাড়ি কৈল দূর।'[৮৭] খুল্লনা অনুযোগ করেছেন – 'পাট সাড়ি নিঞা   মোরে দিল খুঞা।'[৮৮] পাটশাড়ী পরেই খুল্লনা অগ্নিপরীক্ষা দিতে উঠেছিলেন। তিনি সফল হয়েছেন। শাড়ি মলিন হয়নি – 'মলি নাহী পড়ে অঙ্গে পাটের বসন।'[৮৯]

শ্রীমন্ত তাঁর বিবাহের যৌতুক পেয়েছেন পাটশাড়ী—'কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাট সাড়ি।'[৯০] বোঝা যাচ্ছে, মধ্যযুগে পাটশাড়ীর কদর কত বেশি ছিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সমাজ জীবনের নানা প্রয়োজনে সেকালে পাটশাড়ী বহু মূল্যবান শাড়ী রূপেই বিবেচিত হত।

পট্টবস্ত্র ঐশ্বর্যের প্রতীক। ব্যাসদেবের মহাভারতে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। সেকালে রাজা রাজড়ারা পট্টবস্ত্র পরিধান করতেন। দুর্যোধন বিলাস বৈভব এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত হয়েছেন। তিনি পরেছেন পট্টবস্ত্র। মহাভারতকার লিখেছেন –

"আচ্ছাদয়সি প্রাবারান্ পট্টবস্ত্রাণি পিশিতৌদনম্।

আজানেয়া বহন্তি ত্বাং কেনাসি হরিণঃ কৃশঃ।" [৯১]

রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে যুধিষ্ঠিরের জন্য কম্বোজ দেশের রাজা ষোলটি পট্টবস্ত্র উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। সেই পট্টবস্ত্র ছিল নতুন কলাপাতার মত মসৃণ এবং কৃষ্ণবর্ণ , শ্যামবর্ণ ও অরুণবর্ণ। মহাভারতকার লিখেছেন –

"কদলীকোমলত্বঞ্চি কৃষ্ণশ্যামারুণানি চ।

কম্বোজঃ প্রাহিণোত্তস্মৈ নেত্রপট্টানি ষোড়শ।। " [৯২]

বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পের জন্য চিরকালই বিখ্যাত। কার্পাস বস্ত্র শিল্পের প্রশস্ত উপকরণ হলেও পাটের কাপড়ের ব্যবহারও যথেষ্ট ছিল। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব)' গ্রন্থে লিখেছেন- "বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাঙলার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প এবং ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায়। পট্টবস্ত্র বা পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল, এবং নানা উপলক্ষে, বিশেষভাবে পূজা, ব্রত, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারেরও খুব প্রচলন ছিল।মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ সুপ্রচুর।" [৯৩] একালে পট্টবস্ত্রের সেই গৌরবের যুগ বিস্মৃতপ্রায় উপকথার মত আমাদের বেদনা জাগায় মাত্র।

কৌপীন – কৌপীন কোমরে জড়ানোর জন্য এক ধরনের ধূসর বস্ত্রখণ্ড। মেখলা বা কটিবন্ধ বিশেষ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশে সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের কল্পতরু মূর্তি নির্মাণ করেছেন কবিকঙ্কণ| সাধারণত সন্ন্যাসীরা কৌপীন ধারণ করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"তপ্ত কলধৌত-গৌর   ভুবনলোচন চৌর

করঙ্ক কৌপীন দণ্ড-ধারী"|[৯৪]

বণিক খণ্ডে নির্লোভ দরিদ্র নৌশিল্পী পরেছেন সামান্য কৌপীন। বাণিজ্যের জন্য নৌকা নির্মাণের ডাক পেয়েছেন তিনি বণিক দরবারে। বাংলাদেশের দরিদ্র লোকশিল্পীর উপল ব্যথিত জীবনকথাকে এক কলমের টানে ফুটিয়ে তুলেছেন মুকুন্দরাম। কবি লিখেছেন-

"বসনবিহীন   পর্য্যাছ কৌপীন

তথি ডোর শন-দড়ি"। [৯৫]

ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ভারতবর্ষ। ভোগবাদ ভারতীয়দের আদর্শ কখনো হয়ে ওঠে নি। বাংলাদেশের লোকশিল্পীরা দরিদ্র। কিন্তু সততা, সরলতা, লোভহীনতা তাদের হৃদয় ঐশ্বর্য। এই আত্মশক্তি লোকধর্মের মূল প্রেরণা। দারিদ্র্য জর্জর বাঙালি নৌশিল্পী পরেছেন তুচ্ছ কৌপীন। একথা ঠিক, জীবনের এই সামান্য তুচ্ছ অঙ্গাভরণও শিল্প। এগুলি জীবনযাপনের উপকরণ, যা দরিদ্রকে, ত্যাগীকে সুন্দর করে। সন্ন্যাসীকে সুন্দর করে এমন কৌপীন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন- "এই কারণে,পুরাতন মৃদভাণ্ডটি পর্যন্ত-পুরাতন মানব সভ্যতার দ্যোতক বলিয়া ইতিহাস লেখকের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান আছে বলিয়া তাহার ভগ্নাংশ পর্যন্ত প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের সংগ্রহালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে"।[৯৬]

নিছনি- 'নিছনি' বরণ দ্রব্য, আরতির দ্রব্য, বস্ত্র বিশেষ হল নিছনি। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'নিছনি' শব্দের উল্লেখ অনেক বার এসেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবাদিদেব মহেশ্বরের তাপসরূপ ফুটিয়ে তুলতে নিছনির উল্লেখ করেছেন কবি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'চরণ- নিছনি ফুল চরণের রজ

দুর্লভ মানিঞা জার আশ করে অজ'। [৯৭]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশে উল্লিখিত 'নিছনি' অর্ঘ্য-উপহার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে পা মুছিয়ে দেওয়া কথা বলা হয়েছে। অবশ্য নিছনির অর্থ অনেক। 'ধৌতবস্ত্র' বা 'দীপমালা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে নিছনির নানা অর্থ চিহ্নিত করেছেন। তিনি 'আরাধনার অর্ঘ্য উপহার' 'পূজা উপহার'[৯৮] অর্থে নিছনির অর্থ তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন।বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু উল্লিখিত নিছনি শব্দটিকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

একালের শিল্পীরা বৃত্তি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। পল্লী বাংলার শিল্পীরা কলে কারখানায় শ্রমিকের জীবন যাপন করেছেন। পল্লী জীবন সংকুচিত হয়েছে। লোকশিল্পের

অবক্ষয় ও বিকৃতি ঘটেছে। একালের লোকশিল্পকে আর মধ্যযুগের সীমানায় সেভাবে পাওয়া যাবে না। মধ্যযুগের ইহকেন্দ্রিক প্রয়োজন নির্ভর শিল্পে লোভী বণিকের নখর পড়েছে। লেগেছে কালের প্রলেপ। অনেক লোকশিল্প লুপ্ত হয়ে গেছে। এই শিল্পগুলি প্রকৃতপক্ষে জীবনের শিল্প - যা নান্দনিক বিভাসে সমুজ্জ্বল। জাতির সৃষ্টি মুখর সময়ের বিশেষ ক্ষণকে ধারণ করে আছে এগুলি। মুকুন্দরাম এসব শিল্প দিয়েই তাঁর কাব্যকে সৃষ্টিলোকে উত্তীর্ণ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. ভট্টশালী, নলিনীকান্ত,প্রাচীন বঙ্গে দারু–ভাস্কর্য, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃষ্ঠা ৬৫১, সম্পাদক- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি ,ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ১৪

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬২

৪. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়,ভূমিকা- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪২৫, পৃষ্ঠা ১৩৫ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত

৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.) , সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৫. ক) পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ,৭৬

৬. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ,৬৮

৭. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ,১৬১

৮. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ,১৬৫

৯. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, প্রাচ্য প্রসাধনকলা, বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, সম্পা.- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়- সাহিত্য- পরিষৎ, মাঘ-১৪২২, পৃষ্ঠা ৪১৮

১০. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪২৫, পৃষ্ঠা ১৩৬

১১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ১৬৭

১২. সিদ্ধান্তবাগীশ, ভট্টাচার্য, হরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণিঃ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃষ্ঠা ২৪৯

১৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৮২

১৪. Risley, H. H. (Herbert Hope Risley), The Tribes and Castes of Bengal,

Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol. –I, p. 250

১৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ১৯৭

১৬. দত্ত, গুরুসদয়, বাংলার রসকলা প্রতিভা, গুরুসদয় দত্ত নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, সম্পা.- বারিদবরণ ঘোষ, পুনশ্চ, কলকাতা, বইমেলা ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩২৭

১৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৭৭

১৮. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ২২৮

১৯. ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ, অথ হিন্দু ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব সমগ্র, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী- ২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৫

২০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৮৩

২১. মাজি, শ্রীনিশাপতি, গরিবের হাতের কাজ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫১, পৃষ্ঠা ৩৮৩, সম্পা.- কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়,

২২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৪৫

২৩. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৮৪

২৪. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৮৫

২৫. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৫৪

২৬. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৬২

২৭. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১৫৮

২৮. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ২১৫

২৯. ঘোষ, বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ফাল্গুন-১৪০৬, পৃষ্ঠা ৭৪

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭২

৩১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ২৬৮

৩২. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ২৭১

৩৩. ঘোষ, বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ফাল্গুন-১৪০৬, পৃষ্ঠা ৭৪

৩৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ২৭২

৩৫. ঘোষ, বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ফাল্গুন-১৪০৬, পৃষ্ঠা ৭২

৩৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ২২০

৩৭. জসীমউদ্দীন, সুখের বাসর (কবিতা) , নকসী কাঁথার মাঠ(কাব্যগ্রন্থ), জসীমউদ্দীন রচনা সমগ্র, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারী- ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৪৩

৩৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৮০

৩৯. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ২৬৮

৪০. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ২৭১

৪১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬৯২

৪২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৮২

৪৩. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১২৪

৪৪. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৪২১

৪৫. R. V. Russell, The Tribes and Castes of the Central provinces of India, Vol.- I, CPSIA, JCG testing. Com, printed of USA, BVHWOIS 0830231018, P. XliV

৪৬. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ (প্রথম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ -২০০৬ , পৃষ্ঠা ৫৬৬

৪৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৭৮

৪৮. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৬২

৪৯. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ,১৯৬

৫০. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৮০

৫১. ঠাকুর , বলেন্দ্রনাথ, প্রাচ্য প্রসাধনকলা, বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, সম্পা.- ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ ১৪২২, পৃষ্ঠা- ৪২৫

৫২. Martimer, John, A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacturers of Dacca in Bengal, London,141 strand, First Published – 1851, pp.– XV-XVI

৫৩. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১০০

৫৪. Birdwood, George C.M., The Arts of India, C.S.I.M.D. Edin, British Book Company, 3rd Edition -1986, First Published – 1880, Jersey, CI, PP.- 248 , 250

৫৫. শাস্ত্রী,হরপ্রসাদ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, সম্পা. জিসান হাবিব, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৩

৫৬. ঋগ্বেদ সংহিতা(মূল), ২য় মণ্ডল, ৩৮ সূক্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত, সম্পা.- নিমাই চন্দ্র পাল, সদেশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৭৯

৫৭. পূর্বোক্ত ,ষষ্ঠ মণ্ডল, ৯ সূক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩৫

৫৮. R. V. Russell, The Tribes and Castes of the Central provinces of India, Vol.- I, CPSIA, JCG testing. Com, printed of USA, BVHWOIS, 0830231018, PP. - XXVII

৫৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ২০

৬০. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৩৪

৬১. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৮২

৬২. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,আশ্বিন, ১৪০২, পৃষ্ঠা ৪৫৮

৬৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ১০৪

৬৪. Martimer, John, A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacturers of Dacca in Bengal, London, 141 strand, First Published – 1851, pp.-25, chapter - IV

৬৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ১৫৭

৬৬. মিত্র, গৌরহর, বীরভূমের লাক্ষা শিল্প, প্রবাসী, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন-১৩৩৪, পৃষ্ঠা ৬০৭, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ৮২

৬৮. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১৩২

৬৯. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪২৫, পৃষ্ঠা ১৯

৭০. বাল্মীকি, রামায়ণম্ , আদিকান্ড, ৭৭/১০, সম্পা.- পঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৩৩

৭১. পূর্বোক্ত , অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৮/৮৫, পৃষ্ঠা ৩৪০

৭২. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন, সেকালের বসন – ভূষণ, নারায়ণ, শারদীয়া সংখ্যা, কার্তিক – ১৩২২, পৃষ্ঠা ১৩৪৭, সম্পা.– চিত্তরঞ্জন দাশ

৭৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ১৫৫

৭৪. বাল্মীকি, রামায়ণম্ , লঙ্কাকাণ্ড, সম্পা.- পঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, মে ২০১২, পৃষ্ঠা - ৯০৪

৭৫. Chattopadhyay, Kamaladevi, Handicrafts of India, Indian Council for Cultural relations, First Published – 1975, Azad Bhavan, New Delhi, p.-1

৭৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন,

নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,

৭৭. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৩৭

৭৮. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৫৫

৭৯. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৬৭

৮০. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৬৮

৮১. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৮২

৮২. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১১০

৮৩. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১২০

৮৪. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১২১

৮৫. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১২৫

৮৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫

৮৭. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১৩৮

৮৮. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১৪৬

৮৯. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ১৮৯

৯০. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৩০৪

৯১. সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, শ্রীহরিদাস, মহাভারতম্ঃ সভাপর্ব্ব, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৮

৯২. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ৪০১

৯৩. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,আশ্বিন, ১৪০২, পৃষ্ঠা ১৫০

৯৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ২২৯

৯৫. পূর্বোক্তপৃষ্ঠা , ২২৯

৯৬. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪২৫, পৃষ্ঠা ৬

৯৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.),সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃষ্ঠা ১৩

৯৮ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, নিছনি (প্রবন্ধ), শব্দতত্ত্ব(গ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ -১৪০২, পৃষ্ঠা ৭০২,৭০৩